ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 2, No. 2, December 2025

মসলার যুদ্ধ: ভারতবর্ষে উপনিবেশায়নের আখ্যান

ড. রিষিণ পরিমল[১]*
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ।
Corresponding Author: Dr. Rishin Parimal rishinparimal@gmail.com

ARTICLEINFO

সূচকশব্দ: স্মৃতিচারণমূলক, বর্ণনাধর্মী, ভারতবর্ষ, কালিকট, প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মসলা-বাণিজ্য, আধিপত্যবাদ, উপনিবেশায়ন

Received : 17 August 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted: 22 December 2025

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

সংক্ষিপ্তসার

সত্যেন সেন একাধারে রাজনীতিক, সংগঠক ও সাহিত্যিক। তাঁর 'মসলার যুদ্ধ' ইতিহাস ও স্মৃতিচারণমূলক বর্ণনাধর্মী এক গদ্য রচনা। এ গ্রন্থে পনের ও ষোল শতকের ইউরোপীয় আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহ কর্তৃক ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে মসলা-ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে মালাবার অঞ্চলে কালিকট রাজ্য অবস্থিত। মালাবার অঞ্চল ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর মসলা কালিকট বন্দর হয়েই ইউরোপের দেশগুলোতে যেতো। পনের শতকের শেষে কালিকটের মসলা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির ইতিকথা ইউরোপের পোর্তুগাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে পোর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজ বণিকগণ পর্যায়ক্রমে এ অঞ্চলে মসলার বাণিজ্য করতে আসে এবং ধীরে ধীরে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই গ্রন্থে বিধৃত পোর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজদের মসলা-কেন্দ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের জন্য দস্যুতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ এমনকি বাণিজ্যের নামে উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা ইতিহাসের রক্তাক্ত, হিংস্র, বীভৎস, নিষ্ঠুর এক অধ্যায় আমাদের সামনে চিত্রময় করে তোলে। ভারতবর্ষে উপনিবেশায়নের এসব ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধে আলোচ্য।

১.

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) একাধারে রাজনীতিক, সংগঠক ও সাহিত্যিক। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে আশির দশক পর্যন্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সত্যেন সেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বেশকিছু উপন্যাস রচনা করে সাফল্যের অধিকারী হন। সত্যেন সেনের সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করা প্রসঙ্গে এটা সত্য যে তিনি 'সংগ্রামী জীবনের দায়িত্ব পালনের জন্য সাহিত্যে নিয়োজিত হয়েছেন। আর সেই দায়িত্ব পালনে তাঁর যে প্রয়াস ও সাফল্য তা আমাদের জন্য একটি অনন্য ও বহুমাত্রিক সাহিত্য সংস্কৃতির মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছে।'[১] সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অভিজ্ঞতাস্নাত সত্যেন সেন তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতাকে শিল্পের ছাঁচে রূপ দিয়েছেন। 'অবশ্য সাহিত্য যে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ও প্রচলিতের ভাঙাগড়ার অগ্রগতিরধারাকে শুধু প্রতিফলিত করেই ক্ষান্ত থাকতে পারে না, তাকে যে যুক্তি ও আবেগকে সমন্বিত করে মূল্যবোধকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ এবং দুরূহ বৈপ্লবিক গতিধারাও শরিক করে তোলার কাজটুকু করতে হয়, এ কথা মার্কসবাদী সত্যেন সেনের ভালো করেই জানা ছিল।'[২] তাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির তথা সাহিত্যসত্তার দিকটি অনুধাবনের জন্যে 'তাঁর বিপ্লবী জীবনের দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা' সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সত্যেন সেন ছেলেবেলা থেকেই মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের সংস্পর্শে এসেছিলেন। যৌবনের প্রথমদিকে বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী দল 'যুগান্তরে' যোগ দেন। কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিরিশের দশকের অধিকাংশ সময় জেলে কাটান। চল্লিশের দশকের শুরুতে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, কৈশোরকালে তিনি শান্তিনিকেতনের সংস্পর্শে আসেন। 'শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিশ্বমানবিকতা বোধও পেয়েছিলেন যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। এই প্রাপ্তি তাঁর উপন্যাস, কাহিনী ও আলেখ্য রচনায় বড়ো রকমের সহায়তা করেছে।'[৩]

১৯৩৮ সালে কারাগার থেকে মুক্তির পর পুরো চল্লিশের দশক তিনি কৃষক আন্দোলনের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে কায়েমী স্বার্থবাদীদের আগ্রাসী শাসন-শোষণ প্রক্রিয়ার ডামাডোলের মধ্যে গণসংগঠনগুলোকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত হলে ১৯৪৯ সালে আবার বন্দি হন। প্রায় পাঁচ বছর পর ১৯৫৩ সালে মুক্তি পেয়ে ১৯৫৪ সালে পুনরায় জেলে যান। ১৯৫৫তে মুক্তি পান। এ সময় ৩ বছর তিনি 'সংবাদ'-এ সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং তেভাগা আন্দোলন ও হাজং আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তারপর ১৯৫৮–১৯৬৪ পর্যন্ত নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে জেলে ছিলেন। ১৯৬৫ সালে দেশ রক্ষা আইনে বন্দি হয়ে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কারান্তরালে থাকেন। ১৯৬৮ সালে প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে তিনি উদীচী প্রতিষ্ঠা করেন।

সত্যেন সেনের গ্রন্থসংখ্যা তিরিশাধিক, তার মধ্যে পনেরটি উপন্যাস। উপন্যাস ব্যতিত তাঁর অন্যান্য রচনাকে বিষয় বিবেচনায় মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। ক) বিজ্ঞান-চিন্তা বিষয়ক, খ) ইতিহাস ও স্মৃতিচারণমূলক, গ) জীবনীমূলক, ঘ) রাজনীতি ও আন্দোলন-সংগ্রাম বিষয়ক রচনা। ইতিহাস ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের মধ্যে 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' (১৯৫৮), 'গ্রাম বাংলার পথে পথে' (১৯৬৫), 'মসলার যুদ্ধ' (১৯৬৮), 'অভিযাত্রী' (১৯৬৯), 'মেহনতি মানুষ' (১৯৬৯), 'শহরের ইতিকথা' (১৯৭৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো গদ্যে রচিত বর্ণনামূলক এক বিশেষ ধরনের রচনা।

২.

'মসলার যুদ্ধ' সত্যেন সেনের বর্ণনাধর্মী গদ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে পনের ও ষোল শতকের ইউরোপীয় আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহ কর্তৃক ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জে মসলা-ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি ৯টি পর্বে বিভাজিত। এর কাহিনী দুই মহাদেশ তথা এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও ইউরোপ ব্যাপি বিস্তৃত। অধিকন্তু আফ্রিকার কিছু দেশের প্রসঙ্গও এতে উপস্থাপিত হয়েছে।

১ম পর্বে মসলা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধশালী বন্দর কালিকটের ভৌগোলিক অবস্থান ও এ রাজ্যের সম্পদশালী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে আরব সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল মালাবার বা কেরল। তার পূর্বদিকে বিজয়নগর রাজ্য। দুয়ের মাঝখানে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। মালাবার অঞ্চলে অবস্থিত স্বাধীন রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধানতম কালিকট। কালিকটের রাজার বংশীয় নাম জামোরিন। 'এই মালাবার অঞ্চল বহু প্রাচীন কাল থেকেই গোলমরিচের দেশ বলে খ্যাত। দু'হাজার বছর ধরে এখানকার বণিকরা মসলাপাতি, বস্ত্র, মণিমুক্তা, গজদন্ত প্রভৃতি পণ্যে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বাণিজ্য করে আসছে।'[৪] মালাবার অঞ্চল ছাড়া গোলমরিচ, এলাচি প্রভৃতি মসলা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এসব অঞ্চলের মসলাও কালিকট বন্দর হয়েই ইউরোপের দেশগুলোতে যেতো। পনের শতকের শেষ দশকেই কালিকট বন্দরের সমৃদ্ধির খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন দেশের বণিকেরা জাহাজ নিয়ে কালিকটে আসে। তার মধ্যে আরব, হিন্দু, গুজরাটী, চীনা বণিকদের জাহাজের সংখ্যাই ছিল বেশি। তবে সে সময় আরব বণিকেরা বাণিজ্য-কর্মে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

কালিকটের মসলা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির ইতিকথা ইউরোপের পোর্তুগাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে ১৪৮৮ সালে পোর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় দোম জোয়াও কালিকট রাজ্য ও বন্দরের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য পেরো দ্য কোভিলহাম নামে এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠায়। আরব বণিকের ছদ্মবেশে সে ১৪৮৮ সালে কালিকট বন্দরে পৌঁছে। এর প্রায় দশ বছর পর ১৪৯৭ সালে ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে পোর্তুগীজ বণিকদল মসলার বাণিজ্যের জন্য প্রকাশ্যে কালিকটে জাহাজ নিয়ে আসে। ইউরোপীয়দের মধ্যে ভাস্কো দা গামা-ই প্রথম সুদূর আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছিল। পোর্তুগীজদের জাহাজগুলো অপেক্ষাকৃত আধুনিক হওয়ায় কালিকট বন্দরে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের বণিক ও লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবে তাদের জাহাজের সামনে কামান সাজানো ছিল। এমন কামান-সজ্জিত জাহাজ দেখে বণিকদের, বিশেষত আরব বণিকদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। রাজা জামোরিনও উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

২য় ও ৩য় পর্বে ভারতবর্ষের সাথে ইউরোপের প্রাচীন সম্পর্ক, মুসলিম-খ্রিস্টান বিদ্বেষপূর্ণ ভাব, ক্রুসেড, প্রাচীনকালে মসলার বাণিজ্য ও পোর্তুগীজদের ভারতবর্ষে আগমনের সমুদ্রপথ অনুসন্ধান বা আবিষ্কারের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক উল্লেখ করেছেন, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বকাল থেকে গ্রীস ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সেসময় মিশর রোমের শাসনাধীন থাকায় মিশরের বন্দর থেকে রোমের জাহাজগুলো ভারতের বন্দরে বাণিজ্য করতো। তাঁর ভাষায়,

> আরিক্যামেদুর খননের ফলে যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম শতকে রোম সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক ও রোমীয় ভৌগোলিকেরা উপকূল সম্পর্কে ভাল ভাবেই ওয়াকিফহাল ছিলেন। এমন কি তাঁরা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়ে গেছেন। (পৃ: ২৬৬)

ইউরোপের অন্ধকার যুগে এ সম্পর্কের ছেদ পড়ে এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে আরব বণিকেরা বাণিজ্য সম্পর্কের সে জায়গা দখল করে নেয়। শুধু ভারতবর্ষ নয় দেশ-বিদেশে বাণিজ্যের জন্য আরব সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য সাগর, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরও আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজে ছেয়ে গিয়েছিল। ক্রুসেডে জয়লাভের মধ্য দিয়ে আরব বণিকদের বাণিজ্যে আরো অগ্রগতি হয়। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়রা বুঝতে পারে, ঐশ্বর্যপূর্ণ ভূভাগ ভারতবর্ষে পৌঁছাতেই হবে। ইতোমধ্যে মিশর মুসলমানদের করায়ত্ব হয়। উল্লেখ্য মিশরকে পাশ কাটিয়ে ইউরোপ থেকে ভারতে যাওয়া-আসা সম্ভব নয়। ফলে ইউরোপীয়রা সরাসরি মিশরের বিরুদ্ধে ৫ম ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত করে এবং পরাজিত হয়। এতে ভারতে গিয়ে মসলার বাণিজ্য করা তাদের সম্ভব হয় না। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় ভেনিস রাজ্য মিশরের মসলা বাণিজ্যের সোল-এজেন্ট হিসেবে ইউরোপে একচেটিয়া ব্যবসা করে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে।

ভেনিসের পাশের রাজ্য জেনোয়া এবং ইউরোপের আরও কিছু দেশ নানা চেষ্টার পর মসলা-বাণিজ্যে ব্যর্থ হয়ে, একটানা জলপথে ভারতে যাওয়ার পথের সন্ধানে সচেষ্ট হয়। এসব অভিযানের মধ্যে উগোলিনো দ্যা ভিডালডোর অভিযাত্রা উল্লেখযোগ্য। তিনি ১২৯১ সালে জেনোয়া থেকে জিব্রাল্টার হয়ে আফ্রিকার উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যান। এছাড়া ১৩১৭ সালে পোর্তুগালের জাহাজগুলোর অধিনায়ক ছিল জেনোয়াবাসী ম্যানুয়েল পেসানহা। ফলে, 'এটা অনুমান করে নেওয়া যায়, আফ্রিকা মহাদেশকে প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে যাবার পরিকল্পনাটা সর্বপ্রথম জেনোয়াবাসীদের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল।' (পৃ: ২৬৭)

পনের শতকে পোর্তুগালের রাজা দোম হেনরী খ্রিস্টান শক্তির পক্ষে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতৃস্থানীয় বলে স্বীকৃত ছিলেন। তখন ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মসলার বাণিজ্য আরব বণিক তথা মুসলমানদের করায়ত্ব ছিল। এ অঞ্চলের মসলার বাজার দখলে নিতে পারলে পোর্তুগাল সম্পদশালী এবং পৃথিবীর খ্রিস্টান শক্তির পুরোধা হবে– এমন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ দোম হেনরী সুদক্ষ গাণিতিক, মানচিত্রকারক, জ্যোতির্বেত্তা ও নাবিকদের সমন্বয়ে আফ্রিকা ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে যাওয়ার একটানা জলপথ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালান। এ ছাড়া তিনি তখনকার প্রচলিত জাহাজগুলোর উন্নতি সাধন ও নাবিকদের প্রশিক্ষণের জন্য নৌ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রশিক্ষিত নাবিকদের নিয়ে দোম হেনরী অজানা মহাদেশ আফ্রিকার সুদীর্ঘ পশ্চিম উপকূল ধরে বহু বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে এগিয়ে চলেন। 'তারা উপকূলের স্থানে স্থানে যেখানে সম্পদের গন্ধ পেয়েছে সেখানে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের হটিয়ে দিয়ে সেই সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। পথের সন্ধানে এগিয়ে চলতে চলতে আফ্রিকা মহাদেশে পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যের বীজ বুনে চলছিল তারা। এই অনুসন্ধান শেষ করতে বহু বৎসর কেটে গিয়েছিল।' (পৃ: ২৬৯) পোর্তুগীজদের দুঃসাহসিক এ অভিযাত্রার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টান-জগতের ধর্মীয় নেতা রোমের পোপ পঞ্চম নিকোলাস ১৪৫৪ সালে এ ঘোষণা জারী করেন যে পোর্তুগীজরা ভারতবর্ষ পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার করবে তার অধিকার একমাত্র রাজা হেনরীর। এ ঘোষণাকে অনুমোদন করে তৃতীয় ক্যালিকেটাস অনুরূপ আরেকটি ঘোষণা দেন ১৪৫৬ সালে। এই ঘোষণাগুলোর মাধ্যমে সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলকে দখল ও ভোগ করার একচ্ছত্র অধিকার পোর্তুগালকে দেয়া হয়। তাই প্রাচ্যের মসলার বাজার দখল করতে গিয়ে পোর্তুগালকে বহুদিন খ্রিস্টান শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হয়নি। ১৪৬০

সালে রাজা হেনরীর মৃত্যু হলে রাজা দোম ম্যানুয়েল এ অভিযান চালিয়ে যান। ১৪৮৭ সালে বার্থেলেমি ডিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ (ঈধঢ়ব ড়ভ এড়ড়ফ ঐড়ঢ়ব) আবিষ্কার করলে তাদের চোখের সামনে ভারত মহাসাগরের জলরাশি জ্বলজ্বল করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৪র্থ পর্বে ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ অভিযানের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ১৪৯৭ সালের ৭ই জুলাই পোর্তুগালের ট্যাগাস নদীর তীরবর্তী বেলেম জাহাজঘাঁটি থেকে ৪টি জাহাজ নিয়ে এ অভিযান শুরু হয়। ভাস্কো দা গামা পোর্তুগালের নাবিকদের দ্বারা ইতোপূর্বে আবিষ্কৃত জলপথ ধরে উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে ভারত মহাসাগরে আসে। এরপর মোজাম্বিক থেকে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের উপকূলে পৌঁছে যায়। 'এ সময় মিলিন্দির রাজা একজন ভারতীয় নাবিক দিয়ে ভাস্কো দা গামাকে সাহায্য করেন। মিলিন্দি মোজাম্বিকের উত্তরে আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলবর্তী একটি রাজ্য।' (পৃ: ২৭১) শোনা যায়, কয়েক শতক পূর্ব থেকেই এ জলপথ দিয়ে ভারতীয় নাবিকেরা আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের বন্দরগুলোতে চলাচল করতো। ১৪৯৮ সালের ২০শে মে ভাস্কো দা গামার দল কালিকট বন্দরে পৌঁছায়। পোর্তুগীজ জাহাজের কামান-সজ্জা আরব বণিকদের ও রাজা জামোরিনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কালিকটে বাণিজ্যের অনুমতি পেলেও ভাস্কো দা গামা শুল্ক-অব্যাহতি পায়নি। তিনি আরব বণিক ও রাজার মধ্যে সম্পর্কের দৃঢ়তা লক্ষ করেছেন, এমনকি ভারতের মানুষ যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেনি তাও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পোর্তুগালে ফিরে গিয়ে রাজা দোম ম্যানুয়েলের কাছে এসব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

কালিকট রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা-সম্পর্কে অবগত হয়ে রাজা ম্যানুয়েল মসলার বাণিজ্য করায়ত্ব করতে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে দ্বিতীয় অভিযান ভারতের উদ্দেশ্যে পাঠান। পেদ্রো আলভারেজ ক্যাব্রালের নেতৃত্বে ১৫০০ যোদ্ধা ও প্রচুর যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে ৩৩টি জাহাজের বহর যাত্রা শুরু করে। ক্যাব্রাল অন্যান্য জাহাজগুলো দৃষ্টিসীমার বাইরে রেখে প্রথমে ৬টি জাহাজ নিয়ে কালিকট বন্দরে আসে। রাজা জামোরিন ক্যাব্রালকে স্থান নির্ধারণ করে দিলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ব্যবসা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু পোর্তুগীজদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। তারা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এবং হাঙ্গামায় ক্যাব্রালের সহকারী কোরিয়াসহ আরো ৫০ জন পোর্তুগীজ সদস্য নিহত হয়। এ ঘটনায় ক্যাব্রাল কালিকট নগরে কামানের আক্রমণ শুরু করে। এর প্রতিবাদে রাজা জামোরিন ১৫০০ যোদ্ধা ও ৮০টি জাহাজ পাঠিয়ে ক্যাব্রালসহ পোর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিলেন। এভাবেই মসলার যুদ্ধ শুরু।

পোর্তুগীজরা কালিকট ত্যাগ করে ভারত মহাসাগরের অজানা স্থানে আশ্রয় নেয়। এতে পোর্তুগালের রাজা আরও আগ্রাসী হয়ে নিজেকে ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারত– এসব অঞ্চলে নৌ-চলাচল, রাজ্য জয় ও বাণিজ্যের প্রভু বলে ঘোষণা করেন এবং এসব অঞ্চলে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আবারও ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে ১৫টি জাহাজে সামরিক প্রশিক্ষিত ৮০০ সৈন্য নিয়ে কালিকটের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু হয়। মহামান্য পোপের ঘোষণা অনুযায়ী পোর্তুগাল রাজা যেহেতু জলরাজ্যের অধিপতি তাই ভাস্কো দা গামা ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করেই অন্য জাহাজের লোকজনকে আটক ও মালামাল লুটপাট করা শুরু করে। ভারত মহাসাগরে ভাস্কো দা গামার যথেচ্ছাচার ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য কালিকটের প্রবল প্রতিরোধ মোকাবেলা করার জন্য পোর্তুগাল থেকে ভাস্কো দা গামার যাত্রা শুরুর ৫ মাস পর আরও ৫টি জাহাজ পাঠানো হয়।

ভাস্কো দা গামার দস্যুতার কথা কালিকটে পৌঁছায়। এখানকার হিন্দু, মুসলমান, স্থানীয় বণিক, বহির্দেশীয় আরব বণিক সকলের মনেই পোর্তুগীজদের সম্পর্কে ঘৃণা, ক্ষোভ জন্ম নেয় এবং তাদের প্রতিরোধের জন্য সকলে সংকল্পবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য:

> আরব বণিকেরা শুধু বাইরে থেকেই এখানে বাণিজ্য করতে আসে না। অনেক আরব বণিক এখানে বাণিজ্য করতে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। এখন কালিকটকেই তারা তাদের স্বদেশ বলে মনে করে। কালিকটের হিন্দু বণিক, আরব বণিক, সবাই এই দুর্দিনে একমন হয়ে দাঁড়াল। তারা বুঝতে পেরেছিল ওই পোর্তুগীজ দস্যুরা যদি জয়লাভ করতে পারে, তবে সর্বপ্রথমেই তারা এখানকার বণিকদের উৎসন্ন করে তাদের জায়গা দখল করে বসবে। এদেশের কাউকে আর বাণিজ্য করে খেতে হবে না। তারা সংকল্প নিল, ওই বিদেশী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করবার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজার পেছনে দাঁড়াবে। (পৃ: ২৭৫)

কালিকটের রাজা সামনের অগ্নিময় পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরে একদিকে নতুন জাহাজ তৈরি করেন এবং অন্যদিকে নগরের নাবিকদের নিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে পোর্তুগীজদের প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এমন সময় ভাস্কো দা গামার জাহাজের বহর কালিকটের অদূরবর্তী কোচিনের নিকটে এলে কালিকটের যুদ্ধবহরের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়। লেখকের ভাষায়,

> কিন্তু এর নাম যুদ্ধ? একদিকে পোর্তুগীজদের জাহাজ থেকে কামানগুলো অগ্নি উদ্‌গিরণ করে চলেছে। অপর দিকে কালিকটের জাহাজে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা। ঢাল, তরোয়াল দিয়ে কি আর কামানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলে? চলুক আর নাই চলুক, যুদ্ধ কিন্তু চলল। (পৃ: ২৭৬)

অবশেষে কালিকটের নৌ-সেনাপতি কাশিমের রণ-চাতুর্য্যে ভাস্কো দা গামা তথা পোর্তুগীজরা যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে চলে যায়।

৫ম পর্বে পোর্তুগীজদের বার বার কালিকটে আক্রমণ, চাওল-এর যুদ্ধ, দিউ দ্বীপের শাসনকর্তার বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বহু শতবছর ধরে মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, আরবীয়, চীনা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বণিকেরা কালিকটে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য করে এসেছে। কিন্তু পোর্তুগীজদের আক্রমণের পূর্বে এখানে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয়নি। ভাস্কো দা গামা ফিরে যাওয়ার পরপরই নৌ-যোদ্ধা লোপো সোর্‌সের নেতৃত্বে ১৪টি জাহাজের বহর থেকে কালিকটের জাহাজ বহরে ধ্বংসাত্মক কামান-আক্রমণ চালানো হয়। মম্মলির নেতৃত্বে এই জাহাজগুলো ক্রাঙ্গানোর বন্দরে নোঙর করেছিল। কালিকটের অপর একটি বন্দরে বাণিজ্য জাহাজ পাহারারত কতগুলো যুদ্ধজাহাজেও কামান-হামলা চালানো হয়। ফলে কালিকটের রক্ষাব্যুহ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে যুদ্ধ চালানো দুস্কর তাই আরব বণিকদের পরামর্শে রাজা জামোরিন মিশরের সুলতানের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। কেননা তাদের হাতে কামান ছিল।

সেকালে কালিকটে মসলার-বাণিজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা আসছিল মিশরের। ফলে কালিকটের সাহায্য প্রস্তাবে মিশরের সুলতান সম্মত হলেন এবং প্রাজ্ঞ সেনাপতি মীর হুসেনকে এ অভিযানের অধিনায়ক করে পাঠালেন। ১৫০৭ সালে মীর হুসেন দিউ দ্বীপে ঘাঁটি গড়ে। সে সময় পোর্তুগীজরা কোচিনের উপকূলে স্থায়ী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর শাসনকর্তার নাম ছিল ডন ফ্রান্সেসকো দ্য আলমেইডা। তাঁর পুত্র লোরেনকো দ্য আলমেইডা পোর্তুগীজ নৌ-বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কোচিন ও কালিকটের মাঝামাঝি চাওল নামক স্থানে মীর হুসেন ও জামোরিনের যৌথ নৌ-বাহিনীর সাথে পোর্তুগীজ নৌ-বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। দু'দিনের এ যুদ্ধে পোর্তুগীজদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু স্থানীয় শাসনকর্তা ফ্রান্সেসকো দ্য আলমেইডা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে ১৫০৯ সালে দিউ দ্বীপে মীর হুসেনের ঘাঁটির সামনে এসে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবারের যুদ্ধে দিউ দ্বীপের শাসক মালিক আয়াজের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হয়ে মীর হুসেন মিশরে ফিরে গেলে কালিকট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে পোর্তুগীজদের বাঞ্ছাপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৬ষ্ঠ পর্বে কালিকট ও পোর্তুগীজ বাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধকথা বর্ণিত হয়েছে। মিশরের সেনাপতি মীর হুসেন কামানবাহী জাহাজ নিয়ে ফিরে গেলেও পোর্তুগীজরা কালিকট রাজ্য দখল করতে পারেনি তবে তারা প্রাচ্যের সমুদ্রগুলোর একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে ওঠে। এই সমুদ্র-সাম্রাজ্য বিস্তারে এফনুসো আলবুকার্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৫০৬ সালে লোহিত সাগরে বণিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে ত্রিস্তান দ্য কুনহার বাহিনীতে তিনি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পোর্তুগীজদের অধিকার-কৃত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৫০৯ থেকে ১৫৯৯ সাল পর্যন্ত তারা বার বার আক্রমণ করেও কালিকট রাজ্য দখল করতে পারেনি, এমনকি কালিকটের প্রতিরোধে মালাবারের সমুদ্র-উপকূলের কোথাও ঘাঁটি গড়তে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত পোর্তুগীজরা কালিকট অধিকার করার জন্য "ফ্লিট অব পোর্টুগাল" ও "ফ্লিট অব ইণ্ডিয়া" পরিচালনা করে। এবার শুধু নৌ-যুদ্ধ নয়, মূল ভূমিতে ভয়াবহ যুদ্ধ হলো। কালিকটের এই প্রথম স্থলযুদ্ধে পোর্তুগীজরা পর্যুদস্ত হয়। লেখকের বর্ণনা স্মর্তব্য:

> [...] বহু পোর্তুগীজ সৈন্য মারা পড়ল। স্বয়ং গ্র্যাণ্ড মার্শাল অব পোর্টুগাল আর তাঁর ৭০ জন বিশিষ্ট সহচর এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। আর অ্যালবুকার্ক বাঁ হাতে ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত পান। কামানের গোলার ঘায়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়লে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় জাহাজে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। (পৃ: ২৮১)

এই দুর্দিনে প্রতিবেশি কোন রাষ্ট্র কালিকটের পাশে না থাকলেও তাদের নির্ভীক দেশপ্রেম, শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণার লেলিহান প্রতিশোধ-স্পৃহার ফলে এমন প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছিল। এ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য স্মরণযোগ্য:

> আর সেই দেশপ্রেম এতই গভীর যে, তার সামনে হিন্দু আর আরবীর ভেদ-বুদ্ধি তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে গেল। দীর্ঘদিন ধরে এই ঐক্যকে তারা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছিল, ধন্য তাদের দেশপ্রেম। (পৃ: ২৮১)

যুদ্ধ চলাকালে পোর্তুগীজরা বিজয়নগর রাজ্যের রাজার কাছ থেকে ভাটকল নামক স্থানে বাণিজ্য-কুঠি গড়ার অনুমতি পায়। তাছাড়া তুলার্জীর বিশ্বাসঘাতকতায় ১৫১০ সালে বিনাযুদ্ধে বিজাপুর রাজ্যের গোয়া দখল করে।

৭ম পর্বে পোর্তুগীজ কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ায় মসলা-বাণিজ্য প্রসারের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। ১৫১০ সালে পোর্তুগীজরা গোয়া অঞ্চলে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলে। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর ছাড়িয়ে এবার অ্যালবুকার্কের দৃষ্টি পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের দিকে। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন,

> প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জের আধুনিক নাম ইন্দোনেশিয়া। এই দ্বীপগুলোর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। দ্বীপগুলো মসলার জন্য বিখ্যাত। প্রাচীনকাল থেকে এদের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ চলে আসছিল। বহু শতাব্দী আগে ভারতীয়েরা মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোতে, কাম্বোডিয়ায় এবং চম্পা প্রভৃতি স্থানে অনেক উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। (পৃ: ২৮৪)

এছাড়া এ অঞ্চলের পুনি, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপে চীনাদের উপনিবেশ ছিল। চীনের মিঙ রাজত্বের অবসানে সাম্রাজ্যের শক্তি শিথিল হতে থাকে। প্রায় এ সময়ই পোর্তুগীজদের নৌ-বহর এখানকার সাগরে প্রবেশ করে। ১৫০৯ সালে লোপো দ্য সিকুইয়েরা অবস্থা তদন্তের জন্য ৬টি জাহাজ নিয়ে মালাক্কা যায় এবং সুলতানের কাছে বাণিজ্যের অনুমতি পায়। কিন্তু আরব বণিকদের পরামর্শে সুলতানের অনুমতি প্রত্যাহারে ইঙ্গিত পেয়ে সিকুইয়েরা মালাক্কা ত্যাগ করে। এরপর ১৫১১ সালে ১৮টি জাহাজ নিয়ে অ্যালবুকার্ক কোচিন থেকে মালাক্কা যান। তিনি বাণিজ্যের নামে যুদ্ধ জাহাজ এনে ভয়াবহ সংঘর্ষে আরব ও ক্যাম্বের মুসলমান বণিকদের পরাস্ত করে মালাক্কা নগর দখল করেন। উল্লেখ্য, সুলতান ও তাঁর সৈন্যবাহিনী আগেই নগর ত্যাগ করেছিল। চীনা, হিন্দু, বর্মীদের ব্যতিরেকে পোর্তুগীজ বাহিনী নগরবাসী মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে এবং জীবিতদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করে। এ প্রসঙ্গে লেখকের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

> এটা খুবই স্পষ্ট যে, তাদের এই তীব্র মুসলমান-বিদ্বেষের মূল কারণ ধর্ম নয়। এর আসল কারণ তাদের বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধি। এ-বিষয়ে কি রণক্ষেত্রে, কি বাণিজ্যক্ষেত্রে, মুসলমানদেরই তারা সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত। কিন্তু তাই বলে হিন্দু কালিকটকে তারা রেহাই দেয় নি। কালিকট অধিকার করবার জন্য তারা চেষ্টার ত্রুটি করে নি। তার কারণ এখানে মুসলমান অমুসলমানের প্রশ্নটা মূল প্রশ্ন নয়, মূল প্রশ্ন মসলার বাণিজ্য। (পৃ: ২৮৮)

দেশের একটি অংশের জনগণকে পক্ষে রাখার কৌশল রূপে পোর্তুগীজরা এ ধরনের নীতি অনুসরণ করেছে। মূলত তারা স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে নৃশংসভাবে স্বার্থবুদ্ধির সাথে ধর্মীয় প্রেরণার অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়েছে।

মালাক্কা দখলের পর ডেমাকের সুলতানকে পরাজিত করে তারা জাভার সমুদ্রে প্রভুত্ব স্থাপন করে এবং প্রাচ্যের মসলার বাজার হস্তগত করে। পোর্তুগীজ শক্তিকে বিতাড়িত করতে ১৫৩৮ সালে তুরস্ক, কালিকট ও ক্যাম্বে-এ ত্রিশক্তির চুক্তি হয়। কিন্তু ত্রিশক্তিকে ১৫৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ যুদ্ধে পরাস্ত করে পোর্তুগীজরা আরও প্রায় ৬০ বছর প্রবল প্রতাপে এ অঞ্চলের সমুদ্র শাসন করেছে।

৮ম পর্বে প্রাচ্যের মসলার বাণিজ্যে ডাচদের প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে। পোর্তুগীজরা ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে বিভিন্ন ধরনের মসলা ইউরোপে আমদানী করলেও ইউরোপের মসলার ব্যবসা ডাচ বণিকদের হাতে ছিল। বহু বছর পোর্তুগীজদের কাছ থেকে চড়া দামে মসলা কিনে ডাচরা ইউরোপের মধ্য-উত্তরাঞ্চলে বাণিজ্য করেছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে খ্রিস্টান ধর্মে নতুন ভাবধারা যুক্ত হয়েছে– 'প্রোটেস্টান্টবাদ'। রোমান ক্যাথলিকদের থেকে প্রোটেস্টান্টরা আলাদা। পোপ নিকোলাসের পবিত্র আদেশ তাদের কাছে মূল্যহীন। নতুন যুগে এসে তারা পোর্তুগালের কাছে চড়া দামে মসলা ক্রয়ে রাজি নয় বরং তাদের হাত থেকে মসলার বাণিজ্য ছিনিয়ে নিতে সচেষ্ট। ১৫৯২ সালে আমস্টারডামের বিশিষ্ট ডাচ বণিকেরা ভারতবর্ষে ব্যবসার জন্য একটি কোম্পানী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কর্ণেলিয়াস দ্য হাউটম্যান ও জান হুইজেন লিন্সকোটেনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে । ১৫৯৫ সালে হাউটম্যানের নেতৃত্বে ৪টি জাহাজের বহর নিয়ে ডাচ বণিকেরা সরাসরি ইন্দোনেশিয়া পৌঁছায় এবং আড়াই বছর পর স্বদেশে ফিরে যায়। প্রথম বাণিজ্য বহর থেকে সাফল্য আসায় ডাচ বণিকেরা 'ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গঠন করে। ১৬০২ সালে কোম্পানীটি পূর্বাঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার সরকারের কাছে লাভ করে। "শুধু তাই নয়, কোম্পানীকে সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন করা, নতুন এলাকা জয় করা, দুর্গ গঠন করা এবং আরও কোন কোন বিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হ'ল।" (পৃ: ২৯৩) এই অধিকারের ফলে ১৬০৪ সালে কোম্পানীটি কালিকটের রাজার সাথে সন্ধি স্থাপন করে। সন্ধির উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ থেকে পোর্তুগীজদের বিতাড়ন করা।

১৬০৫ সালে এই কোম্পানী পোর্তুগীজদের হাত থেকে এমবয়না দ্বীপ দখল করে। এর ১৪ বছর পর ১৬১৯ সালে কোম্পানীর পক্ষে জান পিয়েটার্জ কোয়েন পোর্তুগীজদের হটিয়ে জাকার্তা অধিকার করে। এ থেকেই ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ী কোয়েন সে সময় কোম্পানীর ডিরেক্টরদের উদ্দেশ্য করে লিখেন,

> ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ উর্বরা ভূমি ও সমুদ্র আপনাদের করতলগত হয়েছে। বিবেচনা করে দেখুন, সাহস থাকলে কি না সম্পন্ন করা যায়! আরও দেখুন, সর্বশক্তিমান ভগবান কি ভাবে আমাদের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং আমাদের উপর সৌভাগ্যধারা বর্ষণ করেছেন। (পৃ: ২৯৩)

১৬৩৩ সালে এন্টনি ভ্যান ভিয়েমেন এই নতুন ডাচ সাম্রাজ্যের গভর্ণর জেনারেল হন। ১৬৪১ সালে তিনি পোর্তুগীজদের হাত থেকে মালাক্কার শক্ত ঘাঁটি দখল করেন। ১৬৫৪ সালে ভ্যানডারহেডেন বহুদিন ধরে কলম্বো বন্দর অবরুদ্ধ করে রাখার ফলে পোর্তুগীজরা সিংহল ছেড়ে যায়। ১৬৬০ সালে ডাচরা তাদের কাছ থেকে কোচিন দখল করে। এরপর থেকে ভারতবর্ষে পোর্তুগীজদের ছোট ছোট বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ধ্বসে পড়তে থাকে। ১৬৬৫ সালে তারা বোম্বাই বন্দর ইংল্যাণ্ডের রাজাকে যৌতুক হিসেবে উপহার দেয়। তবে গোয়া, দামন, দিউ তখনও পোর্তুগীজদের হাতেই ছিল।

লেখকের অবলোকনে, উপনিবেশ স্থাপন নয়, প্রধানত এ অঞ্চলের মসলার বাণিজ্য করায়ত্ব করেই তৃপ্ত ছিল পোর্তুগাল। তবে মসলার বাণিজ্য পাহারা দেয়ার জন্য তারা গোয়া, মালাক্কা ও ইন্দোনেশিয়ার কোন কোন দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ডাচরা শুধু মসলার বাণিজ্য নিয়ে তৃপ্ত না থেকে সাম্রাজ্য গড়ার দিকে মনযোগ দেয়। তারা মসলা চাষে উদ্যোগী হয় এবং বান্দা, এমবয়না, মালাক্কা প্রভৃতি অঞ্চলের চাষীদের আগাম দাদন দেয়া শুরু করে। দাদনের সুযোগ নিয়ে চাষীদের জমি কোম্পানীর নামে জমা করতে থাকে। ক্রমে চাষীদের জমিতে কোম্পানী নিজ কর্তৃত্বে মসলা উৎপাদন করতে শুরু করে।

চাষীরা জনমজুরে পরিণত হয়; তাদের ডাচ মালিকদের নির্ধারিত মজুরীতেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। স্থানে স্থানে এই জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ ডাচদের দমননীতির হিংস্র আক্রমণে চাষীদের রক্তে তাদের চাষের জমি লাল হয়ে উঠেছে। ডাচরা মসলার চাষ বন্ধ করে দেয়ায় মোলাক্কাসের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়ে। ফলে এ অঞ্চলের জনগণ দারিদ্র্যের চরম শিকারে পরিণত হয়। লেখকের ভাষায়,

> এ অবস্থা প্রথমে ঘটল মোলাক্কাসে। তারপর জাভায়। তারপর অন্যান্য দ্বীপে। অর্থাৎ কোম্পানী যেই যেই দ্বীপ অধিকার করে বসল, সকলেই ওই একই অবস্থায় গিয়ে পৌছল। (পৃ. ২৯৬)

১৬৬০ সালের দিকে ইউরোপের বাজারে কফির প্রচলন হয় এবং ক্রমে তার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কফির উপর মুনাফা-লোভী ডাচ কোম্পানীর দৃষ্টি পড়ে। আঠারো শতকের প্রথম দিকে তারা মালাবার থেকে কফির চারা আনিয়ে জাভা দ্বীপে কফির চাষ শুরু করে দেয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কফি এই দ্বীপে প্রধান ফসলে পরিণত হয় এবং লবঙ্গ চাষের পরিধি কমে যায়। সে সময় বাজারে কফির উচ্চমূল্য থাকায় তা দিয়েই এসব দ্বীপবাসীর সমৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব ছিলো। কিন্তু ডাচ কোম্পানী ছিলো এর বিরোধী।

৯ম পর্বে পোর্তুগীজ, ডাচদের পর ইংরেজ বণিকদের মসলার সন্ধানে ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশের এবং ভারতবর্ষে বাণিজ্যের নামে উপনিবেশ স্থাপনের ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে। ডাচ বণিকদের কাছ থেকে মসলা সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডবাসীর মসলার চাহিদা পূরণ হতো। ১৫৯৯ সালে ডাচ বণিকরা মসলার দাম অত্যধিক বাড়িয়ে দিলে ইংরেজ বণিকরা নিজেরাই প্রাচ্যের মসলার বাণিজ্যে উদোগী হয়। উল্লেখ্য, ডাচদের ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠার একবছর পূর্বে ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে প্রাচ্যে একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদ পেয়েছিল। এবার তারা বাণিজ্য শুরু করলো। লেখকের ভাষায়,
কোম্পানীর প্রথম জাহাজ ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪-এ জানুয়ারী তারিখে এই উদ্দেশ্যে প্রাচ্য অঞ্চলে যাত্রা করল। এই জাহাজ মসলার সন্ধানে ইন্দোনেশিয়ার আচিন ও সুমাত্রায় গিয়ে পৌছল।

আড়াই বছর পরে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে জাহাজটি ১০ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড গোলমরিচ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এল। (পৃ. ২৯৯-৩০০)

এইভাবে মসলার দ্বীপ ইন্দোনেশিয়া থেকে ইংরেজ বণিকরা মসলা এনে ব্যবসা চালিয়েছে তবে এ ব্যবসা তাদের লাভজনক হয়নি বরং দেশের অর্থ বাইরে চলে যেতে থাকে। এ অবস্থায় তারা ব্যবসার নতুন পন্থা অনুসরণ করে। ইংরেজ বণিকরা ভারত থেকে বস্ত্র নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বান্টাম ও মোলাক্কাস দ্বীপে বিক্রি করে এবং মুনাফার অর্থ দিয়ে প্রচুর মসলা কিনে বাণিজ্য করে। এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা মুঘল সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ১৬১২ সালে ভারতের সুরাট বন্দরে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ইন্দোনেশিয়ার সাথে চৌদ্দ বছর মসলার বাণিজ্য করার পর ১৬১৫ সালে ডাচদের দাপটে ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করে। "ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে মসলার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এখানকার মসলা পরপর

তিনটি ইউরোপীয় শক্তিকে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে। বাণিজ্য করতে এসে শেষ পর্যন্ত এরা সাম্রাজ্য বিস্তার করে বসল।" (পৃ. ৩০০)

পরিশেষে বলা যায়, 'মসলার যুদ্ধ' গ্রন্থে বিধৃত পোর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজদের মসলা-কেন্দ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের জন্য দস্যুতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ এমনকি বাণিজ্যের নামে উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা ইতিহাসের রক্তাক্ত, হিংস্র, বীভৎস, নিষ্ঠুর এক অধ্যায় আমাদের সামনে চিত্রময় করে তোলে।

৩.

'মসলার যুদ্ধ' উপন্যাস নয়, ইতিহাসের ঘটনা-সংবলিত বর্ণনাধর্মী কাহিনীমূলক এক বিশেষ ধরণের গদ্য-রচনা। এ গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতে এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলদারিত্ব ও উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রাসী ভূমিকা এবং এর বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগণের প্রাথমিক প্রতিরোধের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ। রণেশ দাশগুপ্তের ভাষায়,

> বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখায় সত্যেন সেনের স্থান পুরোভাগে। রাজনৈতিক উপন্যাসও তাঁর একটা বড় কাজ। 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' ও 'মসলার যুদ্ধ' তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষ ধারার শৈলীতেই ঐতিহাসিক কাহিনীচিত্র।[৫]

পনের শতকের পুরনো ইতিহাসের আশ্রয়ে রচিত কাহিনীটির মাধ্যমে সত্যেন সেন পাঠকের সামনে ইতিহাসের নবতর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। তাছাড়া সমকালীন রাজনীতির নানা পাঠ ইতিহাসের ঘটনাবলীর পরতে পরতে বিন্যস্ত হয়েছে। ইতিহাস-আশ্রয়ী এই আখ্যানের অন্তরালে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফাল্গুনধারার মতো বহমান। এ প্রসঙ্গে ড. তপন বাগচী বলেন,

> পুরান এই অধ্যায়ের অবতারণা করে তিনি ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করলেন। বইটি আমাদের ইতিহাসের কথা শোনালেও মূলত রাজনীতির পাঠ রয়েছে এতে। আর এত সহজ ও সরল ভাষায় এটি লেখা যে ছোটোরাও এই বই থেকে আনন্দের পাশাপাশি শিক্ষা লাভ করতে পারবে।[৬]

লেখকের বর্ণনার প্রাখর্য, উপস্থাপন প্রকৌশল, ইতিহাস-বিষয়ক অভিজ্ঞানের গভীরতায় পুরনো ঘটনাবলী পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ, সমকালীন ও সজীব হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য লেখকের বর্ণনাগুণে ঘটনার বিভিন্ন স্থান, সংঘটিত ঘটনাবলী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রতিরোধ প্রভৃতি বাস্তব-সম্মত রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। যেমন,

> এই ঘটনা ঘটবার পরেই ক্যাব্রাল তাঁর জাহাজগুলোকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নগরের উপর কামান দাগতে শুরু করলেন। এই বর্বর আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য জামোরিন ১৫০০ যোদ্ধাসহ ৮০টা জাহাজ পাঠালেন। কালিকটের জাহাজগুলোকে তাড়া করে আসতে দেখে ক্যাব্রাল তাঁর জাহাজগুলোকে নিয়ে ভেগে পড়লেন। এখান থেকেই মসলা যুদ্ধের শুরু। (পৃ. ২৭৩)

পূর্বেই বলা হয়েছে 'মসলার যুদ্ধ' উপন্যাস নয় আর ইতিহাসও নয়; ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র সংবলিত বর্ণনামূলক গদ্য রচনা। এ গ্রন্থে শুধু ভারত ও ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে পোর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নয়, ডাচদের সাথে পোর্তুগীজ ও ইংরেজদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের বিবরণও বিধৃত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে চীনাদের নৌ-অভিযানের কথাও লেখক বর্ণনা করেছেন। যেমন:

> মিঙ সম্রাট ইয়াংলোর রাজত্বকালে চীনাদের নৌ-অভিযান চরম উন্নতি লাভ করে। বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি চেংহো এই অভিযানের পরিচালক ছিলেন। দোভাষী মাহুয়ান তাঁর এই অভিযানের সঙ্গী ছিলেন। মাহুয়ানের লিখিত বৃত্তান্ত থেকেই আমরা চেংহোর দক্ষিণ-সমুদ্র অভিযানের পূর্ণ বিবরণ জানতে পারি। চেংহোর একটি নৌ-বহরে কমপক্ষে ৬৫টি জাহাজ ছিল। তার মধ্যে কতগুলো বৃহদাকার জাহাজও ছিল। চেংহো-যে শুধু প্রশান্ত মহাসাগরেই বিচরণ করতেন তা নয়। তাঁর নৌ-বহর বহুবার সিংহল, কালিকট, এমন কি এডেন পর্যন্ত গেছে। চেংহোর মৃত্যুর পর চীনাদের নৌ-অভিযানের আর কোন বিবরণ আমরা পাই না।

চেংহোর উপর্যুপরি নৌ-অভিযানের ফলে মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি দ্বীপে চীনাদের সাম্রাজ্য বিস্তারিত হয়ে পড়ে। (পৃ. ২৮৪)

বলাবাহুল্য, 'মসলার যুদ্ধ' গদ্য ভাষায় রচিত কাহিনীচিত্র। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের আশ্রয়ে কাহিনী সুসংবদ্ধ ও বিন্যস্ত। তিন মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শতাধিক বছরের তথ্য এ গ্রন্থে সমন্বিত হয়েছে। এসব তথ্য, ঘটনা, চরিত্র সাহিত্যের উপাদানও বটে। সত্যেন সেন আপন প্রতিভাবলে এসব তথ্য-ঘটনা-চরিত্র প্রভৃতির সমান্তরালে সাহিত্য-অভিজ্ঞান যোগে এগুলোকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমেই তিনি 'সংস্কারশূন্য, সর্বগ্রাহী, সেক্যুলার ও সমগ্রতাস্পর্শী-জীবনদৃষ্টি' আয়ত্ব করেছিলেন। রাজনীতি ছাড়াও ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিপুল আগ্রহ ছিল। সর্বোপরি, তিনি

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন। সার্থক ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টির ঔদার্য ও সমগ্রতার ফলে তিনি বিষয়-অন্বেষার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পেরেছেন। ফলে 'মসলার যুদ্ধ' গ্রন্থে বর্ণিত ইতিহাসের রসহীন ঘটনাবলীও গল্পের ধাঁচে লেখার দরুণ হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। সত্যেন সেন জানতেন, ইতিহাসের তথ্য ও ঘটনা সাহিত্যের রসদ জোগান দেয় এবং সাহিত্যও ইতিহাসের তথ্যাশ্রয়ে পরিমিত আবেগ ও কল্পনার সমন্বয়ে শিল্প-সমৃদ্ধ ভাবে প্রকাশ করে তাকে কালজয়ী করে তোলে।

এ গ্রন্থে লেখকের মধ্যে ইতিহাসবেত্তার পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও নির্মোহ দৃষ্টি, রাজনীতিকের বিশ্লেষণ-পারঙ্গমতা, ভূগোলবিদের মানচিত্র-জ্ঞান সর্বোপরি একজন গদ্যশিল্পীর গল্প-বয়ন প্রকৌশল প্রভৃতির পরিচয় পাই। 'মসলার যুদ্ধ' বিচক্ষণ সাহিত্যিক সত্যেন সেনের অনন্য সাহিত্য-সৃষ্টি। এটি ঘটনা-বহুল ও চরিত্র-বহুল আখ্যানমূলক গদ্য রচনা। এর ভাষা সরল, সাধারণের বোধগম্য, সাবলীল, প্রাঞ্জল। সত্যেন সেন এদেশের কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীরভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন। এদেশের মানুষকে ইতিহাস ও রাজনীতি-সচেতন বলা যায় সমকাল-সচেতন করার প্রত্যাশা থেকেই তাঁর এ গ্রন্থ রচনা।

উল্লেখ্য তিনি শুধু মনের প্রেরণাগত তাগিদ থেকে নয়, সমাজ ও মানুষের প্রতি গভীর দায়িত্ব থেকে সাহিত্য-রচনা ও লেখালেখির চর্চা করেছেন। ফলে তাঁর রচনার ভাষা ও শব্দ-নির্মিতি স্বতন্ত্র কাঠামো-বদ্ধ। তিনি অতীতের ঘটনা ও চরিত্রগুলোকে ছোট ছোট বাক্যে, পরিচিত ও শিথিল-বদ্ধ শব্দ-বন্ধে পাঠকের বোধের সীমায় দৃশ্যময় করে তুলেছেন। সহজ ও সাধারণ শব্দ-ব্যবহারের কৌশল 'মসলার যুদ্ধে' লক্ষণীয়। এ গ্রন্থের ভাষা প্রতিবেদন-রচনার ভাষার অনুরূপ অথবা বলা যায়, মার্ক্সবাদী গদ্যশিল্পীর গদ্যশৈলী এ গ্রন্থকে শিল্প-সমৃদ্ধ করেছে। তবে ভাষা চিত্রবহুল। ঘটনার বর্ণনা যেমন প্রাণস্পর্শী; প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার সমতুল। যেমন,

> খোজা আম্বরের ভারী ভারী জাহাজগুলো কামানের গোলার ঘায়ে জখম ও অচল হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু কালিকটের নৌ-সেনাপতি কাশিম সেদিন যে-রণচাতুর্য প্রদর্শন করলেন, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি তাঁর ছোট ছোট জাহাজগুলোকে এমন কৌশলের সঙ্গে পরিচালিত করছিলেন যে, ওরা কিছুতেই তাদের উপর কামান দাগতে পারল না। এই ক্ষিপ্রগতি হালকা জাহাজগুলো পোর্তুগীজদের জাহাজগুলোকে বোলতার মত ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরে ফেলল। এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ভাস্কো দা গামার জীবনে আর কখনও বোধহয় হয় নি। তিনি এদের হাত থেকে কোনমতে অব্যাহতি পেয়ে যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। (পৃ. ২৭৬-২৭৭)

এছাড়াও বর্ণনার স্থানে স্থানে সংলাপধর্মিতা লক্ষণীয়। ফলে চরিত্রগুলো প্রাণময় ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সংলাপ, চিত্রধর্মিতা ও বর্ণনাগুণে 'মসলার যুদ্ধ' গ্রন্থটি পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে এবং একই সংগে পাঠকের মনে অভিযাত্রীর প্রত্যক্ষ শিহরণ সঞ্চারিত করে। পোর্তুগীজরা প্রথমে মসলা-সমৃদ্ধ কালিকট রাজ্যে আসে। তারপর আসে ডাচ ও ইংরেজরা। মসলা-ব্যবসার নামে উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণে তারা সক্রিয় হয়। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষ দেশ-রক্ষা ও সম্পদ-রক্ষা তথা আত্ম-রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইতিহাসের সেই সব প্রাণস্পর্শী কাহিনী সহজ ভাষায় আলাপচারিতা বা স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে 'মসলার যুদ্ধ' গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। বলা যায়, ইতিহাসের ইতিবৃত্ত সমন্বয়ে শিল্প-সমৃদ্ধ সৃষ্টি 'মসলার যুদ্ধ'।

তথ্যসূত্র

হায়াৎ মামুদ, মফিদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'সত্যেন সেন রচনাবলি', ১ম খণ্ড, সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, সরদার ফজলুল করিম কৃত ভূমিকা, পৃ. ২২

রণেশ দাশগুপ্ত, 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৯৭

হায়াৎ মামুদ, মফিদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'সত্যেন সেন রচনাবলি', ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, রণেশ দাশগুপ্ত কৃত ভূমিকা, পৃ. ১৬

হায়াৎ মামুদ, মফিদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'সত্যেন সেন রচনাসমগ্র', ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ: ২৬৩ (এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'মসলার যুদ্ধ' গ্রন্থের উদ্ধৃতসমূহ উক্ত রচনাসমগ্র থেকে গৃহিত হয়েছে)

হায়াৎ মামুদ, মফিদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'সত্যেন সেন রচনাবলি', ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৫

তপন বাগচী, "সত্যেন সেন ও 'মসলার যুদ্ধ'", 'সত্যেন সেন স্মারকগ্রন্থ', কামাল লোহানী ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫০৪